উপসংহার

কালকূট রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে আমরা ভ্রমণ সাহিত্যের হাল্কা আভাস পেলেও সেগুলি, ছকে বাঁধা ভ্রমণ উপন্যাসগুলি থেকে একেবারেই আলাদা রকমের। এক্ষেত্রে শিল্পীর বহির্দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশেছে অন্তরের অনুভূতিময় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। যা পাঠককে এক ভিন্ন রকমের আস্বাদ এনে দেয়। যৌবনের প্রারম্ভে সংবাদপত্রে রিপোর্ট লেখার জন্য এবং বিশেষত চুয়ান্নর শুরুতে চোখের সামনে সমগ্র দেশের মানুষকে একসঙ্গে দেখার বিরল সৌভাগ্য লাভের জন্য লেখক সেই প্রথমবার প্রয়াগের কুম্ভমেলার উদ্দেশ্যে এলাহাবাদে রওনা হন। সেই শুরু, তারপর থেকে চলতে থাকে তাঁর অবিরাম পথ চলা। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—

> ''দেশ থেকে দেশান্তরে তিনি পাড়ি দিয়েছেন... ডেকেছে তাঁকে পাহাড়, ডেকেছে সমুদ্র, নদী। গহনে অথবা গহীনে—জটিল অরণ্যে বা মানুষের মেলায় তিনি ছুটে গেছেন পথ তাঁকে বারে বারে বাউলের একতারা বাজিয়ে ডাক দিয়েছে—তিনি অধীর পথ পাগল পথিকের মতো ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন—আরেক চাবি দিয়ে খুলে দিয়েছেন আরেক দরজা। নিয়ে গেছেন অন্য জগতে।''[১]

ঘর ছেড়ে পথের টানে লেখকের ভ্রমণ যেমন কালকূট সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে বিচিত্র স্থান সীমায়, তেমনি এই স্থান ও নিজের কালের সীমাকে অতিক্রম করে তাঁর মানস ভ্রমণ ঘটে সুদূর অতীতের ইতিহাস, পুরাণ ও জাতীয় ইতিবৃত্তের পথে।

কিন্তু প্রশ্ন হল কে ভ্রমণ করে? ভ্রমণ করে মন। ভ্রমণ করে মানুষের জিজ্ঞাসা, যা শুধুমাত্র দর্শনেই শেষ হয়ে যায় না। থাকা চাই প্রশ্ন। একক ভ্রমণ এবং দলগত ভ্রমণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দলগত ভ্রমণ যা, নিছক আনন্দেপূর্ণ এবং কিছুটা মোটাদাগের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট। অন্যদিকে একক ভ্রমণ তুলনায় অনেক বেশি সূক্ষ্মতা সম্পন্ন। একক চলায় দ্রষ্টা ভ্রমণ পথের দর্শনীয় সমস্ত কিছুকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করেন। মনোসংযোগের ক্ষেত্রে কোনরকম বাধা থাকে না। কালকূটের একাকী ভ্রমণে সেই সূক্ষ্মতার চেতনা তাঁর প্রতিটি যাত্রাপথকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র। এই সূক্ষ্মতার কারণেই কালকূট-সাহিত্য স্থান মাহাত্ম্য থেকে উত্তীর্ণ হতে

পেরেছে মানব মাহাত্ম্যে। অন্যান্য ভ্রমণকারীর মতো পাহাড়-নদী-অরণ্য দেখেই তিনি তৃপ্ত হন না, দেখতে চান মানুষ। মানুষের জীবনের কাছে পৌঁছতে চান, ধরতে চান তাঁর মনের অচেনা জগৎকে। মানুষকে বোঝার জন্য চাই সূক্ষ্মতর অনুভূতি, তীব্র মানবপ্রেম। কালকূট বলেন—''সাধমেটে না মানুষ দেখে, মানুষ চেখে। মানুষের চেয়ে বিচিত্র এ সংসারে আর কী আছে?''[২] এই জন্য মানুষকে দেখা তার বিচিত্র রূপ রচনা করা, নানা স্থান ও কালের পটভূমিতে তাকে উপলব্ধি করা কালকূটের ধর্ম। মানুষকে যত গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন, যতই তার মনের ভিতরে ঢুকতে পারবেন ততই তিনি নিজেকে চিনবেন। কালকূট বলছেন—''বৈচিত্র্যের সন্ধান আমাদের মনেরই সন্ধান, মানুষ খোঁজার ছলে আমরা মন খুঁজি।''[৩] কাজেই মানুষের ভিতর দিয়ে তিনি নিজেকেই খুঁজতে চান, বুঝতে চান। আমরা এই নিজেকেই জানি না। শিল্পী সাহিত্যিকেরা সেই গভীর বোধ নিয়ে জন্মান-যা তাঁদের মনকে, তাঁদের নিজের সত্তাকেই সন্ধান করে ফেরে, রবীন্দ্রনাথের আপনাকে জানার মতো। এই সন্ধান থেকে আসে অধ্যাত্মবাদের চেতনা। এই আধ্যাত্মিক ভ্রমণই মানুষকে তার আত্মিক অনুসন্ধানে সহায়তা করে। যা দৃষ্টিকে অন্তর্দৃষ্টিতে রূপান্তরিত করে দেখায় মৌন পর্বত তখন কেবল আর ভৌগোলিক বিস্ময় নয়, স্তব্ধ সাধনা। ছুটে চলা পাহাড়ী নদী হল অনন্তের ভাষা, উপলখণ্ডরা হল কালের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ।

সাধক তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে গমন করেন নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্যে। পরিব্রাজকও দেশ-দেশান্তরে ঘুরে ফেরেন নিজের উন্মোচনের জন্যে আত্মবিস্তার ও আত্মচেতনা লাভের জন্য নিজের মিথ্যা আত্মাভিমানকে পরিত্যাগ করে সত্য রূপটিকে অনুভব করবার জন্যে। কিন্তু কোন বিশ্বাসে স্থির হওয়ার জন্য এই প্রব্রজ্যা? এর পরিপ্রেক্ষিতে রসসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে হয়—

> ''... সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে দর্শনের মানসে। নিজের অহং ও ক্ষুদ্রতার মোচনে। অনন্ত এক বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে। সমর্পিত হওয়ার জন্যে। আমি নয় তুমি এই বোধদয়ের জন্যে। ... তখন আর ছোটাছুটি নেই, তখন উপলব্ধির সাধনা, নিমজ্জনের প্রয়াস। সিন্ধুতে বিন্দুর পতন। তোমাতে আমাতে একাকার হওয়া।''[৪]

জগতের অসীম রহস্যকে জানার জন্য সমস্ত প্রাচীন ধর্মের উদ্ভব। আর আত্মলাভের জন্য যে

ধর্ম তা মানুষের নিজের সম্বন্ধে বিস্ময় থেকে উৎপন্ন হয়। নিজেকে জানা মানে নিজের অন্তরাত্মাকে জানা বা বোঝা। অর্থাৎ কিনা 'আমি মানুষের' ভেতরের এক অভ্যন্তরীন মানুষের পরিচয় উন্মোচন। এর সঙ্গে চলতে থাকে—'নিজেকে জানার সঙ্গে তোমাকে চেনা'র পালা। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিজেদের স্বরূপকে চিনবো ততক্ষণ অন্যকে চেনার পালা অসমাপ্ত রয়ে যায়। তবে কালকূটের সঙ্গে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ধারণার পার্থক্য আছে। কালকূট মানুষকে চিনে নিজেকে চিনেছেন, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে দর্শন করতে চান। কালকূটের লেখায় তোমাকে চেনার ভিতর দিয়ে নিজেকে চেনা, 'আমি'র বোধোদয়ের জন্য, তাঁর বিচিত্রকে অনুভব করা। সঞ্জীববাবুর জানা 'তুমি'র বোধোদয়ের জন্য জানা। কালকূট কবি, সঞ্জীববাবু ভক্ত। তিনি সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে খোঁজেন। নিজের অহং মোচনই তাঁর কাম্য। সমরেশ নিজেকে জানতে চান, সেজন্য জগৎ জোড়া মানুষের জীবনের বৈচিত্র্য দেখে তাঁর আত্ম স্বরূপের সন্ধান চলতেই থাকে। একটু আগেই তাঁর লেখা থেকে যে কথা উদ্ধৃত করেছি—

> ''মানুষ খোঁজার ছলে আমরা মন খুঁজি''—এরকম কথা তাঁর অনেক লেখায় পাওয়া যাবে। (বিশাল সংসারের) ''রূপের নেশা আমাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যায়।'' একে তিনি বলেন— ''বিশাল জীবনের অঙ্গনে নিজেকে আর এক রকমের আবিষ্কার। নিজেকেই নতুন করে খুঁজে ফেরা।''[৫]

এই নিজেকে চেনার কথা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ বলে আসছে। উপনিষদের জানায় যে গভীর আত্মবোধের কথা আছে হয়তো এক ভাবে তারই প্রভাব সমস্ত ভাবুক মানুষের মনকে ছুঁয়ে যায়। কিন্তু সেই আত্মোপলব্ধির কথাও সমরেশ, কালকূট বলছেন না। অমৃতকুম্ভের সন্ধানে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

> ''দেখে শেষ হয় না, আশ মেটে না পথের এই বিচিত্র রূপ দেখে, ভাবি যার বেশ এত বিচিত্র, তার হৃদয় ও চরিত্রের গতিবিধি না জানি আরও কত বিচিত্র ... ডুব দেব সেই হৃদিকুম্ভে, রূপে তাকে চিনব না প্রাণে প্রাণে বুঝব বলে ডুব দতে চাই... ভারতের এই বিচিত্র আরশিতে

নিজের মুখটি ভালো করে যাচাই করবো বলেই তো এসেছি। সে মুখ আমার মন আমার ধর্ম।”[৬]

ভ্রমণ অনুরাগী কালকূটের বাউল বিবাগী মনে যখনই বাইরের ডাক এসে নাড়া দিয়ে যায় তখনই তিনি ঘর-সংসার, পরিবার-পরিবেশকে অতিক্রম করে বেরিয়ে পড়েন মানুষের মেলায়। তবে শহরের মিছিল থেকে, গাঁয়ে-গঞ্জের মেলা তাঁকে বেশি করে টানে। আর তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানোর এক অনন্য অনুভূতি তাঁকে ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে যায়। আশৈশব এই বেরিয়ে পড়ার মধ্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু, পুণ্যলোভাতুর বা জ্ঞানান্বেষীদের মতো তাঁর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না ঠিকই কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কেন তাঁর এই বারংবার এমন করে বেরিয়ে পড়া? এর একটা সম্ভাব্য কারণ— ‘‘মানুষ বাইরের জগতকে যতই আবিষ্কার করুক, সে তার নিজের কাছে ততটাই অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। ... সাহিত্যিকেরাও বোধ হয় আত্ম আবিষ্কারের কথা চিন্তা করেন, আধুনিক সাহিত্যের সেটাও একটা লক্ষণ।...” [৭] কিন্তু কালকূট তাঁর শিল্পী সত্তাকে কীভাবে আবিষ্কার করেন মানুষের মাঝে গিয়ে? সমরেশ বসু নামে লিখিত উপন্যাসগুলিতে লেখকের জগৎ ও জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন এবং জীবন ভাবনার বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও বিশেষ ধরণ ধারণ সুস্পষ্ট ভাবেই ভাষারূপ পেয়েছে। কিন্তু এর পরেও সমরেশ বসু বাইরে থেকে ভিতরে যেতে চেয়েছিলেন। কারণ সমগ্রকে না দেখতে পেলে চিত্তের মুক্তি নেই, শিল্পীর মুক্তি প্রয়োজন। সেই কারণেই কালকূট ছদ্মনাম নিয়ে তাঁর ভিন্ন প্রকৃতির লেখার জগতে বিচরণ করে ফেরেন। যার শুরু প্রয়াগের কুম্ভমেলার হাত ধরে। লেখকের নিজস্ব বয়ানে এইরকম—

‘‘নিজেকে জানা মানেই, নিজেকে খোঁজা। ভেবেছিলাম, আত্ম-আবিষ্কারের এই তত্ত্বটির সন্ধান দিয়েছে, পাশ্চাত্যের চিন্তার আধুনিকতা। তা সত্যি না। ‘মনোব্রহ্মেতি ব্যাজানীয়াৎ’। এই প্রাচীনতর ভারতের দান আমি প্রয়াগেই পেয়েছিলাম। কেবল জানিনে সকলের প্রতি আমার বুকে আর কপালে রাখা জোড় হাতের নমস্কার, কবে নিজের প্রতি ফিরবে। নমোমাহত্যং আর সেই দিনটির স্বরূপই বা কী।”[৮]

কালকূটকে খুব কাছ থেকে দেখা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় এই ব্যক্তিই যখন কালকূট, যখন তিনি ঝোলাঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কাছে পিঠে অথবা দূরে সুদূরে তখন তিনি

অন্যলোকে। বাউল বা তান্ত্রিকের সঙ্গে তাদের আখড়ায়, আবার কখনও তিনি পূর্বস্থলীর কোন বৈষ্ণব-বাউলের আসরে মেতে যান।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' লেখকের ভারতদর্শনের রূপ ফুটে ওঠে। 'আমি গিয়েছিলাম ভারতদর্শনে।' কিন্তু একে তিনি ভারত আত্মার খোঁজও বলতে চান না, এর মধ্যে কোনো দার্শনিকতাও দেখাতে চান না। ''আমার ভারত দর্শন সহজ ভাবের বিষয়।''[৯] প্রকৃতপক্ষে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' গ্রন্থে তিনি প্রয়াগের কুম্ভ মেলায় গিয়ে খুঁজে পেয়েছেন মানব-হৃদয়-কুম্ভের অমৃত' কিংবা কেবল অমৃত নয়—বিষ ও অমৃতের এক অতি অনাস্বাদিত রস—মানব জীবনোত্থিত সে রস আর কোথাও মেলে না। মানুষের বিচিত্র চিত্ত গহনের গূঢ় রূপকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন—ডা. পাঁচুগোপাল, ট্রেনে দেখা অন্ধ্রদেশের ভাইয়েরা, নক্কীদাসীর মূল গায়েন বলরাম, নর্থ ওয়েস্টার্ণ রেস্টুরেন্টের রমণীমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ, তার অল্পবয়সী বউ, ভূতানন্দ ও তার ভৈরবী—চণ্ডিকা, ছেলে বউয়ের সংসারে অবাঞ্ছিত হিদের মা—শ্যামা, রঘু আর রুক্মিণীর সেই প্রায়—অলৌকিক প্রেমকাহিনি—রামজীদাসী—আরও কত মানুষের মধ্যে। বিচিত্র মানব জীবনের মহামেলা তো সেই অমৃতকুম্ভ মেলা।

কালকূট যেমন তাঁর পথ চলার ফাঁকে বিচিত্র যাপিত জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন, ঠিক তেমনি ধর্মের মূলে প্রবেশ করে সেই ধর্মের সারবত্তাকে অনুভব করতে চেয়েছেন। তাঁর মনে হয় যে তিনি, সত্য-মিথ্যার বিচার জানেন না, মোক্ষমুক্তি বোঝেন না কিন্তু সংসারে যে বস্তুকে কেন্দ্র করে কত মানুষের কত ধ্যান-ধারণা, আজন্ম লালিত বিশ্বাস, যার বিচিত্র স্রোত নানা দিকে বহমান, তাকে তিনি হেলায় পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না। ধর্মের নামে যে হিসাবে ধার্মিক বোঝায় তা তিনি নন ঠিকই কিন্তু 'ধর্মবোধ' বলতে যাকে অন্য কথায় আত্মায় প্রোথিত ঈশ্বর চেতনা ও নৈতিক বোধ বলা যেতে পারে, তা তাঁর জীবনে ধ্রুব নক্ষত্রের কাজ করেছে। প্রয়াগে যাত্রার পূর্বে বন্ধুর বিদ্রূপ ভরা প্রশ্ন—'কেন যাচ্ছ কুম্ভমেলা? ধর্ম করতে নাকি?' এর উত্তরে লেখক বলতে পারেন—''ধর্মান্ধ! লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি ধর্মান্ধ হয়, তবে খুঁজেই দেখি না কেন, লক্ষ মনের কোন্ চোখে পরানো আছে সেই ঠুলি!''[১০] সংসারে আমরা সীমাবদ্ধ ও গণ্ডিবদ্ধ জীবনদর্শনের কচকচি নিয়ে জীবন অতিবাহিত করি। কিন্তু দেশের কোটি কোটি মানুষ যা নিয়ে মরে বাঁচে, এমনকি নিজেকে জাতীয় বিশেষত্বের চৌহদ্দির মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেয়। এই বিশেষ একাত্মময় অনুভূতিকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনরকম যুক্তি

তিনি খুঁজে পান না। নিজেকে দেখবার জন্য, খুঁজে পাবার জন্য লেখক রূপনগরের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। রূপনগরের 'সে-জন' কে খুঁজতে খুঁজতে অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ও পরিণত কালকূট স্বয়ং সত্তার ভেতরে পূর্ণ সৌন্দর্যে বিরাজিত সেই 'রূপ'কে অনুধাবন করেন। সেই আপন ঘরের অন্বেষণের মধ্যেই চলে 'আত্মানুসন্ধান'। এর অর্থই সর্বশক্তিমানের সন্ধান বা অমৃতের সন্ধান। আত্মের মধ্যে সমগ্রের স্বরূপকে অনুধাবনের আকাঙ্ক্ষা লেখকের কথায়— সেই নমস্কার, কবে নিজের প্রতি ফিরবে। অমৃতকুম্ভের মেলায় যদি ভারতের বহু প্রদেশের বিচিত্র মানুষের হৃদয়দুয়ার উন্মোচন করে দেখানো হয় তবে 'কোথায় পাব তারে' এই বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে সেই মানুষের দর্শন। তবে সেই দর্শনে কেবল অন্তরোন্মোচন নয় আরো একটু গভীরতর সেই সন্ধান—প্রকৃতির রূপের হাটে অরূপের সন্ধান। কালকূট বলছেন—''এই মানুষ আর প্রকৃতির রূপের হাটে অরূপের নাম যদি দিই মনের মানুষ তবে কেমন হয়।''[১১] লেখকের মানব দর্শন এখন রূপকে ছাড়িয়ে অরূপে উত্তীর্ণ হতে চাইছে। কিন্তু রূপ কখনো নির্বিশেষ ভাবরূপে পরিণত হতে পারেনি—তাঁর অরূপ সবসময় রূপের সঙ্গ ধরেই চলে। তার লেখায় ঘুরে ফিরে তাই লালন ফকিরের গান উঠে আসে— 'আমি একদিনও না দেখিলাম তারে। আমার ঘরের কাছে আরশীনগর এক পড়শী বসত করে।' দেহসত্তার মধ্যে যে এক 'মহাভাবুক'-এর বাস, সেই সত্যসন্ধ, সাধক, কবি, দার্শনিক তথা 'অধরা-অহং' সত্তাটিই লালন ফকিরের 'পড়শী'। এবং দেহসত্তা আরশীনগর। এই বোধ কালকূট তাঁর স্বকীয় সত্তার মধ্যে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু লালন আর তাঁর সন্ধান এক নয়। তিনি বলেন— ''কিন্তু আমি তো আর সাধক না।... বরং আমার আরশীনগর যদি হয় জগৎ ও জগৎ জন, তাদের মধ্যে আমার পড়শী সত্তাটির সন্ধানেই নামের আড়ালে ঘুরে ফেরা।''[১২] তবে ধীরে ধীরে পরিণতমনস্ক কালকূট এক ভাবানুধ্যানের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, যেখানে দেহাভ্যন্তরীণ মহাভাবুক 'অধরা-অহং' সত্তাকে পড়শী মনে করার মধ্যে সাধনার পূর্ণতাই অনুভূত হয়। ''সংসারে কেউ কেউ ঈশ্বরের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। কেউ নিজেকে। বিল্বমঙ্গল আসলে নিজেকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। যে নিজেকে খোঁজে, জগৎ-সংসার তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে।''[১৩] এই বোধই তাঁর নিচের কথায় স্পষ্ট হয়।

নিজেকে খোঁজার অর্থ—

''নিজের ভেতরের অন্ধকার, অসহায়তাকে খোঁজা। এই আমি জানি।

> এ না জানার কষ্ট যাকে বিঁধেছে তার নিস্তার নেই। এটা যখন স্থূল জ্ঞানের পথে চলে, তখন দেখি, কত বাহ্যিক বিচিত্র বিশাল অবাক সব আবিষ্কার! মানুষের জন্মকাল থেকে এটা চলে আসছে। কিন্তু নিজেকে দেখা, আর দেখার সেই আলোয় সংসারকে দেখতে পাওয়া ওটা স্থূল জ্ঞানে হয় না। পূর্ণতা যার সাধনা, নিজেকে দেখতে আবার পথেই সে ঘোরে।..."[১৪]

কালকূট তাঁর প্রাণের টানেই বেরিয়ে পড়েন স্থান হতে স্থানান্তরে। এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র স্থানের বর্ণনা বা ভ্রমণকারীর মানসিক সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করা নয়। বরং গহীন প্রকৃতির ভ্রমণের মাঝে তাঁর একাকী মনের ডুব দেওয়া। বিচিত্র প্রকৃতির পাশাপাশি বিচিত্র মানুষের মাঝে তাঁর অবিরত অনুসন্ধান চলতে থাকে। খুঁজে পেতে চান তাঁর মনের মানুষকে। সেই মানুষের মাঝেই চলতে থাকে আত্ম আবিষ্কারের নিরন্তর প্রয়াস। যেমন কালকূটের সৃষ্ট এক বিখ্যাত চরিত্র মামুদ গাজীর অভাব থাকলেও, অবহেলা পেলেও সবকিছুকে অতিক্রম করে মনের আনন্দে মুরশেদের নামের মজদুরি করে ফেরে। ঘাড় অবধি বাবরি চুলে, ঝাপটা দিয়ে সে মনের খুশিতে গান গেয়ে ওঠে।

কালকূটের মনে বিস্ময় জাগে—

> ''চেয়ে দেখি, গাজীর চোখে ঝিকিমিকি।... কাঁধে ঝোলা, গায়ে আলখাল্লা, যে নামেরই মজুর হোক, এই তালিতে ধূলাতে রুক্ষুসুক্ষু মানুষটা এক প্রকার ভিখারি ছাড়া আর কী! জীবন কাটে যার দরজায় দরজায়, পথে পথে, নামের গান করে, হাত পেতে যার ভরণপোষণ সে ... এমন হাসি হেসে, এমন কথা বলতে পারে...।... আধুনিকতার সুখের বেড়া ডিঙিয়ে চলে যায়, রাঢ়ের ছাতিম গাছের তলায়। যাকে ঘর থেকে দিয়েছি সরিয়ে, একেবারে দাওয়ার নিচে, সেও ধুলোয় বসে হেসে হেসে এমন কথা বলে।"[১৫]

একমাত্র ভারতবর্ষের দরজা খুলে উঁকি দিলেই দেখা যাবে হাটের মাঝে, চালচুলোহীন মানুষ তত্ত্বকথা বলে। এই দেশ জেনেছে যে, সোনার চেয়েও দামী যত সব মহৎ প্রাণের জন্ম এই দেশের ধূলায়, এবং এই ধূলাতেই লয়। এই দেশ তাই গায়ে ধুলা মেখে মিষ্টি হাসে, তত্ত্ব

ভাষে। হর্ম্যতল ছেড়ে গাছতলাতে এসে সে পরম কথা শুনিয়েছে। রূপকে অরূপ করেছে।

কোন আকষর্ণে মানুষ ধন-জন-গৃহসুখ ইত্যাদি অনায়াসে বিসর্জন দিয়ে পথকেই জীবনের সম্বল করেন সেই রহস্যই কালকূট জানতে চান। যে অধরা অরূপকে আমরা এই রূপ ও রসের জগতের অধিবাসীরা সহজে বুঝতে পারি না, সেই প্রাচীন ধারাকে কালকূট তাঁর আধুনিক মন নিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। কালকূট সাহিত্য ভারত আত্মার মূল প্রকৃতিকে চেনার ক্ষেত্রেও সহায়ক। বাউল ভাবনার সুরের মূর্ছনায় সেই চেনা যেন আরো সুদৃঢ় হয়।

ধর্মপ্রাণ ভারতীয়র একটি পরিচয় আমরা পুণ্যকামী মানুষের ভিড়ে বোঝাই প্রয়াগমুখী ট্রেনের বাস্তবচিত্রে সুস্পষ্টভাবে পাই। সেখানেই লেখক প্রথম অনেকের ব্যক্তিমানসের পরিচয়ের মধ্যেই ধর্মভীরু অখণ্ড ভারতীয় মানসকে খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। কালকূটকে বলতে হয়েছে—

> ''আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ যা নিয়ে মরে বাঁচে (তা ভালো কি মন্দ জানি নে), সে তার জাতীয় বিশেষত্ব নিয়ে যেখানে মিলিত হয়, যেখানে আমাদের সমস্ত জাতি হাসে কাঁদে গান গায়, তাকে ... আমি অবহেলা করবো কী করে! ... যদি নুয়ে আসে মাথা তাকে আমি মিথ্যে অহংকার দিয়ে জোর করে তুলে ধরবো না। আমি যদি থাকতে পারি নিরাসক্ত তা-ই থাকবো। এত বড় দেশ, এত মানুষ, কত তার বৈচিত্র্য!'' [১৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসটি একদিকে বিশ্বাত্মবোধের উপাসনায় ভরপুর অন্যদিকে তেমনি ভারতসত্তার পরিচায়ক। ভারতীয় জীবন সাধনার মর্মমূলে যা প্রোথিত তা হলো বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিভেদ বৈচিত্র্যের ভিতর সামঞ্জস্য সন্ধান।

মূলত বিশাল বিস্তৃত ভারতবর্ষকে চিনতে চাওয়ার গভীর মমতাই কালকূটকে ঘর ছেড়ে বাইরের পথে টেনে বের করেছে। ভারতের একটি বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ শক্তি, বিশেষ সত্যকে সমগ্ররূপে তিনি অনুভব করতে চান। তাই ধর্মান্ধ ভারতবর্ষ, না খেতে পাওয়ার দেশ ভারতবর্ষ, জীবন যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত মানুষ কোন বিশ্বাসের বলে শুধুমাত্র মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ তা তাঁর অন্বেষণের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। ১৯৫৪ -তে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' দিয়ে যাত্রা শুরু হয় যে লেখকের, তিনি মূলতঃ মানুষের রূপ অন্বেষণেই তাঁর ভ্রমণকে অব্যাহত রেখেছেন কারণ

'মানুষ'-ই তাঁর অমৃতকুম্ভ। কিন্তু মানুষের ঠিক কোন ছবিকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। স্বয়ং কালকূটের বয়ানে—

> ''আমার ভারতদর্শন সহজ ভাবের বিষয়। কচি শিশুটিকে কোথায় তুমি পূর্ণরূপে দেখতে পাবে? মায়ের কোলে। ... শহর, নগর, গ্রাম, জনপদ ঘুরে, ভারতকে প্রত্যহের দেখার সঙ্গে, এই দেখাটার তফাৎ আছে। এখানে তার কোন বাড়ালো আবডাল নেই, জীবনযাপনের নানা তুচ্ছতা নেই, জীবনের প্রয়োজনে আত্মগোপনের প্রয়াস নেই। এইখানে সে স্বরূপে বিরাজ করে।''[১৭]

তথাকথিত ভ্রমণ বলতে আমরা মূলত যা বুঝি সেই উদ্দেশ্য নিয়ে কালকূট পথে বের হননি। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে, অথবা বহুজন পদবিধৌত তীর্থভূমি মেলা প্রাঙ্গণে তিনি খুঁজে পেতে চান কোন এক অনির্বচনীয় সত্তাকে, 'স্বদেশ-আত্মা' যার একমাত্র নাম। স্বদেশের চিত্তকে চিনতে চেয়েছিলেন বলেই বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং মেলা বা তীর্থ প্রাঙ্গণে অবস্থিত অতি তুচ্ছ সাধারণ মানুষও তাঁর দৃষ্টিপথে ধরা দেয়। সমাজের প্রতিটি স্তরের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর স্বভূমিকে জানতে চান। বলা যায় সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ওপরে যার ভিত্তি স্থাপিত এক সুদূর ভবিষ্যতে যার গতিপথ বিলীন।

দেশকালের এক বিস্তৃত ব্যপ্তিতে স্বদেশাত্মাকে আবিষ্কার করতে হলে প্রথমেই দেশের মানুষ, দেশের মাটিকে অনুপুঙ্খরূপে জেনে নিতে হয়। সেই জানা ক্রমশ এগিয়ে যায়, সাংস্কৃতির অন্তঃসলিলা ধারা বেয়ে। কীভাবে সেই ধারাকে গ্রহণ করে মানুষ তার অন্তরকে সজীব রাখে। এই সমস্ত কিছুকে লেখক তাঁর গভীর অনুধ্যানের মাধ্যমে উপন্যাসগুলিতে ধরে রাখার প্রয়াস চালিয়েছেন। কাল থেকে কালান্তর যুগ থেকে যুগান্তর। কাল যায়, যুগ যায়। যাওয়ার সময় সে তার ছাপ রেখে যায়। সবই মানুষের কীর্তি। মানুষ ভাঙে, আবার মানুষই গড়ে। সেই পেছনের দিকে তাকিয়ে লেখকের দু'চোখ জলে ভরে আসে। মুগ্ধ হন। শ্রদ্ধায় নিজেরই অজান্তে দু-হাত কপালে উঠে আসে।

১৯৫৪-তে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পক্ষ থেকে প্রথম, প্রয়াগে গিয়ে উপস্থিত হন, সেবারে তাঁর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল। লেখকের নিজস্ব বয়ানে—

> ''চললো আমার ভারত দর্শন। রোজ চিঠি একটা লিখি, সংবাদ দিয়ে।

কিন্তু কতটুকু আর লেখা যায়! সংবাদের থেকেও আমার প্রাণে বাজছে অন্য সুর! কবির কবিতা আমার প্রাণে বাজছে অন্য সুরে! কবির কবিতা আমার চোখে এই ভারত রূপ দেখেই ভোর, 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু/নয়ন না তিরপিত ভেল/লাখো লাখো যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু/তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' পুরাণ আর ইতিহাসের স্মৃতি, আর সারা ভারতের মানুষ, তাদের ভাষা পোষাক খাদ্য আর নানান ধর্মীয় আচরণ, মনে হচ্ছে, আমি যুগ যুগান্তের এক লীলাক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি! এই রূপের মধ্যে আমার চোখে ভেসে উঠছে, হাজার হাজার বছর আগের নানান ঘটনা। যেন এক আবছায়ায় আমি সবাইকে দেখতে পাচ্ছি।"[১৮]

প্রয়াগের মেলায় লেখকের নগর সভ্য চোখের দৃষ্টি আরেক রূপের দর্শন করে। ঝুসির নগ্ন নাগা সাধুর দল, গঙ্গার তীরে প্রয়াগস্তোত্র পাঠরত বিবস্ত্র অবধূত পরিবার বা পুণ্যস্নানের সময় নদীর জলে নগ্ন সাধুনী থেকে জনপদের রমণী, সকলেরই নগ্নতার রূপের মধ্যেই কী গভীর উদাসীনতা! নগ্নতার কী বিচিত্র মূর্তি! হাতি ঘোড়ার পিঠে মখমলের নক্‌শা কাটা ঝালরের রাজকীয় আসনে নানা সাধুর দল সওয়ার হন, কিন্তু প্রত্যেকেই উলঙ্গ উদাসীন সন্ন্যাসী। লেখকের মনে হয় এমনটা আর জগতের কোথাও দেখা যায় না কিন্তু এ নগ্নতা ওই আকাশের মতো, গঙ্গা-যমুনার চরের মতো দ্বিধামুক্ত নগ্নতা, কী ভয়ংকর অথচ কী অপরূপ! যাকে শুধুমাত্র কুসংস্কার বলে দূরে সরে থাকলে হবে না। ভারত দর্শন কর, দর্শন কর আপনাকে এ ছবি কোন যুগের হাত ধরে এসে এখনও বর্তমান। এও দেশেরই এক রূপ, ঘুরে ফিরে নিজেকেই দেখা। লেখকের বয়ানে—

"...পাশ্চাত্যের নগ্নতার ছবি দেখেছি। চিরায়ত চিত্রাবলী ছাড়াও হাল দুনিয়ার পশ্চিমী নগ্নতা নিয়ে আমাদের কী ধীক্কার! কিন্তু নদীর জলে সিনান করি বসি বালুচরে, ভারতীয় নারীদের এই নগ্নতার মধ্যেও দেখেছি ভারত দর্শনেরই এক রূপ। যেন এই পুণ্যভূমিতে আবরণই বা কী, নগ্নতাই বা কী! সকলই সমান, এখানে সঁপেছি প্রাণ।"[১৯]

কালকূটের বিবাগী মন এইভাবেই ঘুরে ফেরে তার সঠিক পথের দিশা সন্ধানে। যার নাম

আত্মানুসন্ধান। ভারতের বিচিত্র আরশিতে লেখক নিজের মন, ধর্মকে যাচাই করবেন বলেই প্রয়াগে ছুটে যান। শম্ভুনাথ চক্রবর্তীর ভাষায়— ''এই মন বা ধর্মই একটি মানুষের ভিতরের পরিচয়। এই 'ভিতর'-টি আত্মতত্ত্ব লাভের সহায়ক শক্তি। নিজের বেদনা বা প্রাপ্তির আর্তিতে খুঁজে ফেরার অভিজ্ঞতায় পুষ্ট, ভিতরের মানুষটির প্রকৃত অনুসন্ধানই, অমৃত যাত্রার স্বরূপ।''[২০] একটা মানুষের দুটো দিক রয়েছে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীন। এই যে বাহ্যিক খোলস তা প্রথম পরিচয়ে বা বহুদিনের পরিচয়েও উন্মোচিত হয় না। এমনকি বলা চলে—

> ''মানুষ তার নিজের কাছে অনেকখানি অপরিচিত নিজেকে চিনে ওঠাই তার পক্ষে দুষ্কর। মানুষ তার নিজের কাছে নিজেই যদি অনেকখানি পরিমাণে অজ্ঞাত না থাকত, তা হলে পৃথিবীতে অনেক ঘটনাই ঘটত না। নিজেকে চেনার অহংকার, মানুষের না থাকাই উচিত। কেন না, এটা একটা আবিষ্কারের বিষয়। এটা মানুষের নিজের সঙ্গে নিজেরই একটা সংগ্রাম। মানুষ তার নিজেকে যত বেশি চিনতে পারে তত বেশী অপরকেও।'' [২১]

বিশেষ এক পরিবেশে বিশেষ কোনো মানুষের কাছেই মনের কথা বলা যায়। সেই মনের মানুষ সব মানুষের মধ্যে মেলে না। লেখকের সামনে যখন মনোময় মানুষ, আত্মসমীক্ষক মানুষ, নিজের কাছে নিজেরই হিশাব-নিকাশের জন্য উদ্বিগ্ন মানুষ আত্মউন্মোচনে প্রবৃত্ত হয় তখন এক দিক দিয়ে সেই ব্যক্তিরও চলতে থাকে জীবন রহস্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা। আবার অন্যদিকে শিল্পী যেহেতু এদের মধ্যেই নিজেকে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান সেই হেতু তখন তা শিল্পীরও আত্মানুসন্ধান।

তথ্যসূত্র :

১. ভূমিকাংশ—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—কালকূট রচনা সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড—সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—পঞ্চম মুদ্রণ—আগস্ট, ১৯৮৮

২. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৬০

৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ৫৯

৪. ভূমিকা অংশ—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়—ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ—শিবশংকর ভারতী—সাহিত্যম্ —২০১০—পৃ. ৭

৫. পিঞ্জরে অচিন পাখি---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ২৪৬১

৬. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৮১

৭. পিঞ্জরে অচিন পাখি---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ২৫০৬

৮. পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র, অষ্টম খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩৩৯৫

৯. ঘরের কাছে আরশিনগর—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯—পৃ. ২০৮০

১০. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৫৯

১১. কোথায় পাবো তারে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৫৬৬

১২. গাহে অচিন পাখি---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৪০

১৩. যে খোঁজে আপন ঘরে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র, সপ্তম খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩১৪৮

১৪. পূর্বোক্ত

১৫. কোথায় পাবো তারে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৬৩৮

১৬. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৬৩

১৭. ঘরের কাছে আরশিনগর—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড—নিতাই বসু

সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ২০৮০

১৮. গাহে অচিন পাখি—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৪৭

১৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ৪৬

২০. কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে—শম্ভুনাথ চক্রবর্তী—সাহিত্যায়ন—ডিসেম্বর, ১৯৯৫—পৃ. ৪

২১. মেলার নিশি—সমরেশ বসু—সমরেশ বসু রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা—আনন্দ পাবলিশার্স—জানুয়ারি, ২০০০—পৃ. ৬৭২